Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 430–435
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

নিম্নবর্গের উত্তরণ : মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প

গুরুদাস বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি
ই-মেইল: gurudasbiswas1947@gmail.com

ড. সমরেশ মজুমদার
তত্ত্বাবধায়ক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি
বীরভূম

Keyword
মহাশ্বেতা দেবী, জীবন চিত্র, গল্পগ্রন্থ, নিম্নবিত্ত, ডাইনি, ধৌলী, স্তন্যদায়িনী

Abstract

Discussion

ব্যষ্টি-জীবনের এবং সমাজ জীবনের উত্তরণটাই আসল কথা। সাহিত্য যেহেতু ব্যষ্টি জীবনের এবং সমাজ জীবনের প্রতিফলিত দর্পণ সেহেতু সাহিত্যে উত্তরণ থাকতেই হবে। লেখকের লেখার মধ্য দিয়ে সে উত্তরণ প্রকাশ পাবে। সাহিত্যে সেই লেখকের লেখা ততবেশি কালজয়ী যার লেখায় উত্তরণটা ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়।

রবীন্দ্র সাহিত্যে উত্তরণ সীমা থেকে অসীমের পথে যাত্রা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরণ নতুন এক সমাজ ভাবনায়। সেখানে ভিকুর পাঁচীকে বিবাহের মধ্যে দিয়ে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের ভাবনার মধ্যে দিয়ে সেই উত্তরণ প্রকাশ পেয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় নিম্নবিত্তের মানুষের জীবন চিত্র বেশি করে প্রস্ফুটিত হলেও তিনি মূলত ঐতিহ্য সচেতন লেখিকা। সে ঐতিহ্য সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক সমাজ ভাবনার উত্তরণ। লেখিকা তার প্রতিটি গল্পগ্রন্থের ভূমিকাতে সে কথার প্রতিধ্বনি করে তার গল্প সমগ্র গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় বলেছেন –

> "সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদন্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকদের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোন লেখককেই মূল্যায়ন করা যায় না। পুরাকথাকে পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য।"[১]

এখন একেকজন লেখকের উত্তরণ ভাবনা এক এক রকম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরণ যেমন সীমা থেকে অসীমে। মহাশ্বেতা দেবীর উত্তরণ সীমা থেকে অসীমে নয়; নিম্নবিত্তের মানুষের দুঃখ যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তির উপায় খোঁজা।

উত্তরণের রূপরেখা :

'হারুন সালেমের মাসি' –

গল্পে দেখি একজন মুসলমান অনাথ বালককে মাতৃত্বে আশ্রয় দেওয়ার কারণে যশীর উপর যে ধর্মমতীয় সামাজিক নির্যাতন শুরু হয়েছে, যশী তার থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে সে বলেছে হারু –

"হ্যাঁ। চল আমরা চলে যাব' কোথা? 'শাওরে।"[২]

এই যে নতুন কোন শহরে চলে যেতে চাওয়া এটাই গল্পে লেখিকার উত্তরণ ভাবনা। পরিচিত সমাজ যেখানে মানুষে মানুষে বিভেদ করছে, অপরিচিত সমাজ সেখানে না মুসলমান হারুনের কথা জানতে পারবে না হিন্দু যশীর কথা জানতে পারবে। নতুন শহর শুধু জানবে একজন মা তার সন্তানকে নিয়ে জীবন সংগ্রাম করছে। এই যে মনুষ্যত্বের পরিচয়ের মধ্যে মানবতাকে মিশিয়ে দেওয়া এটাই মহাশ্বেতা দেবীর উত্তরণ। এই উত্তরণ ভাবনা আমরা বিভিন্ন গল্পের মধ্যে পাই।

'ডাইনি' –

গল্পেও উত্তরণের বিশেষ চিত্র ফুটে উঠেছে। এই গল্পে মানব সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার দিক তুলে ধরেছেন। মূর্খ অন্ত্যজ শ্রেণীর আদিবাসী সমাজের মধ্যে ডাইনি প্রথা সম্পর্কে মজ্জাগত একটি সংস্কার মেনে চলে। তাদের সমাজ বিশ্বাস করে যে কোনো মানুষের উপর যদি প্রেত বা পিশাচ ভর করে তাহলে তারা ডাইনি হয়ে পড়ে। তখন তাদের ডাইনি অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই সুযোগ নিয়েই গল্পে ধনশালী হনুমান মিত্র সহজ সরল মানুষদের ওপর নিকৃষ্ট অপকৌশল চালিয়েছে। বোবা অসহায় মেয়ে সোমরিকে গর্ভবতী করেছে হনুমান মিশ্রের ছেলে। অথচ সেই দোষ ঢাকতে সোমরিকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয় এবং ডাইনির মিথ্যা কাহিনী ছড়িয়েছে অন্ধকারে থাকা কুসংস্কার গ্রস্ত গ্রামের সাধারণ মানুষদের মধ্যে। এভাবেই হনুমান মিশ্রের মতো মানুষ দিনের পর দিন তাদের অপরাধকে আড়াল করে রাখে। শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীরা আসল সত্য জানতে পেরে গর্জে ওঠে এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। অন্ত্যজ শ্রেণীর গঞ্জু, দোসাদ, ধবী ও মুন্ডাদের পরিবর্তনের আন্দোলন আমাদের মনের কোণে ক্ষীণ আশার আলো সঞ্চার করে। সমাজকে কলুষতা মুক্ত করতে কুসংস্কার এবং সত্য উদঘাটনের জন্য যে সাধারণের জাগরণের মধ্যে দিয়েই উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় নব্য ও সভ্য সমাজ গড়ার, যা তিনি গল্পের শেষ লাইনে ব্যক্ত করে গেছেন,

"ওরা পেছনে চাইল না। সামনে এখনো অনেক পথ হাঁটতে হবে।"[৩]

'ধৌলী' –

গল্পেও আমরা উত্তরণের বিষয়টি খুঁজে পাই। জনম দুঃখী হতদরিদ্র আদিবাসীদের মেয়ে ধৌলী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ মিশ্রলালের প্রেমে লালসার ফাঁদে পড়ে কিভাবে বঞ্চনার শিকার হয়েছে। অকালে স্বামী মারা যাওয়ায় ধৌলী চলে আসে মায়ের কাছে। যেখানে ছিল দারিদ্রতা অনাহার আর হাড় হিম করা খাটুনি। সেই সুযোগ নিয়ে মিশ্রলাল প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে গর্ভবতী করে দেয়। অথচ নিম্নবর্গের মেয়ে বলে বাবার চোখ রাঙানিতে মিশ্রলাল ধৌলীকে পরিত্যাগ করে। সমাজের বিচারেও সব দোষ ধৌলীর উপরেই বর্তায়। অবশেষে পতিতাবৃত্তির পথে যেতে বাধ্য হয়। গল্পের শেষে লেখিকা ধৌলীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন -

"এই গাছ-আকাশ-মাটি, এরাও মিশ্রদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে?"[৪]

এই উক্তির মধ্য দিয়েই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সমাজের আসল রূপ। ধৌলীর চরম পরিণতির জন্য কারা দায়ী? কারা তাকে নরকে নিক্ষেপ করেছে? অথচ দিনের আলোর মত পরিষ্কার তাদের কোন শাস্তি হয় না। তাদের অর্থ ও পতি-পত্তির জোড়ে সমাজের বুকে দাপিয়ে বেড়ায়। শুধু তাই নয় তারাই শাসন করে সমাজকে। মহাশ্বেতা দেবী সেই সমাজ ব্যবস্থাকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মানুষেরা নিজেদের দেবতা ভেবে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নরকের পথে ঠেলে দেয়। যে নিকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা আজও অসহায় মানুষকে নিমজ্জিত রেখেছে অন্ধকারে তা থেকে উত্তরণের ভাব প্রকাশেই এই গল্প রচনা।

'নিহত ও মৃত' –

এই গল্পের ভাবনা 'এইচ. এফ. ৩৭ রিপোর্টাজ' গল্পের সাথে মিল রয়েছে। এ গল্পের লেখক অতি কৌশলে তুলে ধরেছেন শাসন ব্যবস্থার অনমনীয়তা এবং তার কবলে পড়া সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণীর বিরম্বনার কথা। মিশ্র বক্রোক্তি ও দরদ মিশ্রিত সহানুভূতি পাঠককে গল্প আস্বাদনের পর দীর্ঘ সময় ধরে নিশ্চুপ করে দেয়। গল্পের প্রধান চরিত্র ভগীরথ ও তার দুই বন্ধু মধু ও কৈলাস এরা সকলেই সর্বহারা শ্রেণী পরিবারের সদস্য। অতীতে ভগীরথের কিছু সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া গেলেও বর্তমানে সে ভিখিরির পর্যায়ে। প্রাণ বাঁচাতে স্টেশনে ও ট্রেনে ধুপ বেঁচে বেড়ায়। মধু, কৈলাস স্টেশনে চক্কর দেয় ও রিকশা চালায়। এরূপ পরিবারের সাধারন ছেলে ভগীরথ তার মৃটা

ঠাকুরমার লাশ হাসপাতাল থেকে আনতে গেলে সে বাধাপ্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয় তিরস্কারের মুখেও পড়তে হয় ডাক্তার ও প্রশাসনের তরফ থেকে ভগীরথকে প্রশ্ন করা হয় যে তারা সম্পত্তি বা টাকার লোভে বুড়ি কে কি মেরে ফেলেছে? এছাড়াও বলা হয়েছে তোমাদের মত নিচু ছোট জাতের মানুষরা এই ভাবেই বয়স্কদের মেরে ফেলে তার সম্পত্তি দখল নেয়, তোমরাও তাই করেছো। অথচ তার ঠাকুমার সাথে ভগীরথের তেমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। গল্পের শেষে ভগীরথকে বলতে শোনা যায়,

> "ঠাকুমার অ্যালুমিনিয়ামের একটি হাঁড়ি কেনার বড় সাধ ছিল সে যেন পূরণ হয় অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ইলেক্ট্রিক চুল্লির মধ্যে গিয়ে।"[৫]

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার শিকার যে মানুষগুলো তাদের আঁতের কথা, অবজ্ঞার কথা, তিরস্কারের কথা মহাশ্বেতা এই গল্পে বিনয়ের সাথে দেখিয়েছেন এবং যেন প্রশ্ন তুলেছেন এভাবেই কী তারা কাল হতে কালান্তর পতিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত হয়ে থাকবে সমাজের বুকে? গল্পের শেষে উত্তরণ রূপে এ ভাবনাই যেন প্রকাশ করেছেন।

'স্তন্যদায়িনী' –

এই গল্পে দেখা যায় কাঙালীচরণের স্ত্রী যশোদা স্তনকে মূলধন করে অন্ন সংস্থানের সমস্যা মিটেয়েছে। অপারগ স্বামী, নিজের পা দুটো কিমা ধরেছে তবুও ভরাডুবি সংসারকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য তার জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। নিজের সন্তান পালন, স্বামীর লালসা বৃত্তি নিবারণ এবং হালদার বাবুর বাড়ির সন্তানদের দুধ খাইয়ে সুস্থ রাখা এছাড়াও তাদের বাড়ির বউদের ফিটনেস অব্যাহত রাখা যেন তার গুরুদায়িত্বের মধ্যে ছিল।

এইভাবে সংসার ও সমাজের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে যখন যশোদা ক্যান্সারে আক্রান্ত হল তখন কিন্তু তার দেখাশোনা এবং তার প্রতি কর্তব্যের জন্য কাউকে দেখা যায়নি। নিম্নবর্গের যশোদার মৃত্যু যেন পাঠক হৃদয়কে ব্যথিত করে তোলে। লেখক উপসংহারে বলেছেন -

> "এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।"[৬]

এখানেই ফুটে উঠেছে সমাজের স্বার্থপর দিকটি। একজন মহিলা এবং তার পরিবার সমাজকে নিজেদের জীবনের শেষ বিন্দু দিয়ে সেবা করে তার প্রতিদানে স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তাদেরকে বিতাড়িত তিরস্কার আর অবহেলা ছাড়া কিছুই দেয়নি। এখানে প্রচলিত বাক্য যেন ফুটে উঠেছে, পুড়বে নারী উড়বে ছাই, তবে নারীর গুন গাই। এ সংস্কার যেন আজও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পাথর চাপার মতো রয়ে গেছে। কতদিন এই অবহেলা ও স্বার্থপরতা? সমাজকে সুন্দর করণে, মহাশ্বেতা আরো একবার সমাজকে সচেতনতার বার্তা দিয়ে উত্তরণের পথ দেখালেন।

'সাঁঝ সকালের মা' –

এই গল্পে আমরা দেখি সাধন উদর সর্বস্ব অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়-সম্বলহীন এক নির্বোধ বালক। তার কাছে শুধু তার মা'ই একমাত্র এই সসাগরা পৃথিবী। সারাদিন তার মা তাকে ভাত খাওয়াবে বলে জটি ঠাকুরানীর নামে মাদুলি তাবিজ বিক্রি করে সে টাকা পয়সা নেয় না, নেয় চাল আর সেই চাল নিয়ে এসে দিনশেষে ভাত রান্না করে ছেলেকে পেট ভরে খেতে

দেয়। এই কাজ করতে গিয়েও তাকে সমাজের লালসা পরিপূর্ণ মানুষের রোষে পড়তে হয়। অন্যদিকে সাধন শুধু ভাত পেটুক ছেলে সে শুধু ভাত খেতে চায়। ভাত ছাড়া তাঁর অন্য কিছু ভালো লাগে না। এভাবেই তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্পন্ন জীবন চলতে চলতে হঠাৎ করে জটি ঠাকুরানীর মারা যায়। তারপর সাধন তার মায়ের শ্রাদ্ধে আঠারো টাকার বিনিময় এই সসাগরা পৃথিবী দান করে। কিন্তু শ্রাদ্ধের শেষে সে শ্রাদ্ধের চাল ডাল ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সে বলে ওঠে এ চাল আমার, চাল তোমায় দেব না এ সালামি বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভাত রান্না করব। মাটির গন্ধে তার মন ভরে ওঠে এবং ভাতের গন্ধে তার মাকে সে খুঁজে পায়। এই গল্পের শেষে লেখিকার একটি উক্তির মধ্যে দিয়ে উত্তরণের দিকটি খুঁজে পাওয়া যায় সাধন বলে -

"মা তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও, সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।"[৭]

এ কথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে ক্ষুধার তাড়নার নির্মম চিত্র। যেখানে সমাজ ব্যবস্থা থেকে অবহেলিত হয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জীবন যা ফোন করছিল। জটি ঠাকুরানীর তাদের জীবনের ন্যূনতম শেষ অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেছে তাই ক্ষুধা নিবারণের জন্য আজ অসহায় মানুষদের হয়ে সমাজের কাছে এর উত্তর চেয়ে যেন এক নতুন উত্তরণের ভাবনা মহাশ্বেতা দেবী উল্লেখ করেছেন।

'বান' –

এই গল্পে বান বলতে বৃষ্টির জলে প্লাবিত বন্যার কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস নেওয়ার পর তিনি যে মানব মিলনের জন্য প্রেমের বানে ছিলেন সারাদেশে সে কথা। সমাজের প্রতি মানুষদের উদ্ধার করে মিলনের মন্ত্রে বাঁধতে চেয়ে ছিলেন। সারাদেশের সমস্ত জাতি, বর্ণ, বৈষম্য, ভেদাভেদ মুছে দিয়ে। কিন্তু তাতো মোছার নয়, সমাজে উঁচুতলার ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত আইন-কানুন রীতিনীতি একমাত্র তারাই পরিচালনা করবে আর তার কবলে পড়ে মুচি, বাগদী, ডোম, আদিবাসী, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি মানুষেরা কদর করে মেনে চলবে এ রীতি লংঘন করবে কে? সেই নিয়ম মেনে আচার্য বাড়ির লোকজনও চায়না বুনো, বাগদি বা নিচু জাতের মানুষ তাদের বারান্দায়, উঠোনে,ঘরে,উঠুক। তবুও সুযোগসন্ধানী আচার্য চৈতন্য মহাপ্রভু আসবেন বলে তিনি কথা দিয়েছিলেন বুনো বাগদী নিচু জাতের সকল মানুষ তার উঠোনে উঠতে পারবে, সেদিন পেট ভরে খেতে পারবে। বাগদির ছেলে চিনি বাসো আশায় বুক বেধে ছিল আচার্য বাড়ির উঠোনে বসে পেট ভরে নানা ব্যঞ্জনে খেতে পারবে। কিন্তু দিন শেষ হয়ে গেলেও চৈতন্যদেব আসেননি, আসেনি তার প্রেমের বান। এজন্য চিনিবাস সহ অন্যান্যদের আর আচার্য বাড়ির নানা ব্যঞ্জনে খাওয়া হলো না। তাদের বিতাড়িত করা হলো মুড়ি বাতাসা দিয়ে। একদিকে অন্ত্যজ শ্রেণীর বা এই মানুষদের উপর শাসন শাসন করে আচার্য বাড়ির স্বচ্ছলতা অন্যদিকে এই মানুষদের ন্যূনতম ভরপেট খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা ভঙ্গ করেছেন শুধুমাত্র চৈতন্যদেব না আসায়। এক নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পের শেষে, তাই লেখিকা চিনিবাসের ঠাকুমাকে বলতে শুনেছেন,

"কেমন বান আর আসেনা? সেই যে যেমন বানে চিড়ে মুড়ি চাল দেয় এত? দুষ্কু ঘুচে যায়?"[৮]

অর্থাৎ যে বাণী উঁচু-নিচু সমান হয়ে যাবে কোন ভেদাভেদ রইবে না সমাজের বুকে। ন্যূনতম অধিকার তারা পাবে, কোন দুঃখ কষ্ট রইবে না। সমাজে যে প্রথা আজও চালু রয়েছে যার ফলে পতিত জনেরা আজও পতিত হয়ে রয়েছে। সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। তা থেকে সমাজকে মুক্ত হতে যেন উত্তরণের কথা মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পে উল্লেখ করেছেন।

'জগমোহনের মৃত্যু' –

এ গল্পেও আমরা দেখি মূল্যবোধের এক নগ্ন চিত্র জাত্যভিমান, ধর্ম, জাতপাত বিভাজিত সমাজব্যবস্থাকে কিভাবে শিকার করেছে নানা স্তর থেকে। এই গল্পটিতে সেই মুন্সিয়ানার সঙ্গে যেন উপস্থাপন করেছেন লেখিকা। গল্প পড়তে পড়তে

তাই আমরা বেশ কয়েক জায়গায় থমকে দাঁড়াবো, নড়েচড়ে বসতে অবশ্যই বাধ্য হব, তা প্রকাশ পেয়েছে জগমোহনের মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে দিয়ে। ছোটলোক ছোটলোক হয়ে থাকবে তার প্রকাশ ঘটেছে। প্রতিটি সংসদীয় দল কিভাবে নিপীড়িত মানুষের উদ্দেশ্যে নানা আশ্বাসের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন তাদের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। অথচ গতানুগতিক ধারায় সাধারণ নিপীড়িত মানুষ যে বঞ্চিত-শোষিত হয়ে আসছে তার প্রতিরোধে কোন সড়ক পথ তাদের জন্য গড়ে ওঠেনি এই সমাজের বুকে। তাই জাতপাত শ্রেণীবিভাগ অত্যাচারে জর্জরিত অন্ধকার সমাজের প্রতি লেখিকা তার খুব প্রকাশ করেছেন গল্পের শেষ লাইনে, উত্তরণের বার্তা দিয়ে,

> "স্টেশন প্ল্যাটফর্ম একমাত্র ঠিকানা হয় যাদের তাদের নাম না জানলেও ভারতবর্ষের চলে কেননা ওরা অত্যন্ত এক্সপেন্ডেবল...।"[৯]

'বাঁয়েন' –

বাঁয়েন গল্পে তথাকথিত কুসংস্কারের এক ভয়ানক চিত্র ফুটে উঠেছে। চন্ডী ছিল মলিন্দ'রের সাধারণ স্ত্রী, সন্তান ভগীরথ।কিন্তু হঠাৎ করে চন্ডী তথাকথিত কুসংস্কারের কুনজরে পড়ে হয়ে ওঠে বাঁয়েন। অর্থাৎ ডাইনীর মতোই, ডাইনি হলে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হয় আর বাঁয়েন হলে গ্রামের ছেলে পেলে যেন না মারা যায় এবং অমঙ্গল না হয় সেজন্য তাকে গ্রামের এক প্রান্তে নির্বাসন দেওয়া হয়। গ্রামের এক কোণে তার মাথা গোঁজার ন্যূনতম স্থান দেওয়া হয়। সন্তান ও স্বামীর স্নেহ ভালোবাসা সেখানে পরিত্যক্ত। মহিন্দর সবে মহাকুমার লাশঘরে কাজে যোগ দিয়েছে। চন্ডীকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও সে এখন অপারগ তার কাছে যাওয়া আসার জন্য। কেননা সমাজ ব্যবস্থার কাছে সে আবদ্ধ। ওদিকে ছেলে ভগীরথ মা থেকেও মাতৃহীন হয়ে সমাজের বুকে অতিকষ্টে সে বড় হয়ে উঠছে। বাবাকে প্রশ্ন করে ভগীরথ মায়ের কথা জানার জন্য, বলে তোর মা আগে মানুষ ছিল, তোর মা ছিল সে, সমাজ একসময় তোর মাকে বাঁয়েন ঘোষণা করেছিল। তাই তোর মা গ্রাম থেকে বিতাড়িত। এখানে সমাজব্যবস্থাই শেষ কথা। কিন্তু অবশেষে সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের লোকেদের নিজের জীবন দিয়ে রেল দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, সেও রক্তমাংসের মানবিক গুণ সম্পূর্ণা সামাজিক স্নেহময়ী এক জননী। বাঁয়েন নয়, সেও সমাজের এক নারী। সমাজের ঘৃণ্য কুসংস্কার এবং জীবিত থেকেও বংশ পরিচয়ে মৃত এ থেকে উত্তরণের কথা তিনি ভগীরথের বংশ পরিচয়ের মধ্যে যেন তুলে ধরেছেন গল্পের শেষে,

> "বাপ পূজ্য মলিন্দ গঙ্গাপুত্র। নিবাস ডোমপাড়া। মা ঈশ্বর চন্ডী গঙ্গাদাসী...। ভগীরথ বংশ পরিচয় দিতে লাগলো।"[১০]

তাই পরিশেষে উপনীত হয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যেকোনো লেখকের লেখা সমাজের উপর, মানুষের উপর, দেশের উপর, বিশ্বের উপর কী প্রভাব বিস্তার করবে বা কী বার্তা দেবে সে কথাই আমরা পেয়ে থাকি। উত্তরণের মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী সেই এক'ই ইচ্ছা যেন প্রকাশ করেছেন। তার ছোটগল্পের শেষে উত্তরণের কথা উল্লেখ করে গেছেন। যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বাস্তবতার ভূমিতে নব সূর্যোদয়ের বার্তা বহন করবে। পরিবর্তনের সাথে সাথে মানব সমাজের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন দরকার সেই লক্ষ্যেই তিনি উত্তরণের এই ভাবনাকে প্রত্যেক গল্পের উপসংহারে লিপিবদ্ধ করেছেন। যে উত্তরণ এনে দেবে নতুন সামাজিক পরিকাঠামো এবং "নব্য মানবতাবাদ"[১১] এর উন্মেষ।

তথ্যসূত্র :

১. দেবী, মহাশ্বেতা 'গল্পসমগ্র' এর শেষ পৃষ্ঠা, দে সুধাংশুশেখর, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩
২. 'হারুন সালেমের মাসি', ঐ, পৃ. ৯৮
৩. 'ডাইনি', ঐ, পৃ. ৩৫৫
৪. 'ধৌলী', ঐ, পৃ. ২৯৭

৫. 'নিহত ও মৃত', ঐ, পৃ. ১৫০
৬. 'স্তন্যদায়িনী', ঐ, পৃ. ১৬৯
৭. 'সাঁঝ সকালের মা', ঐ, পৃ. ৭০
৮. 'বান', ঐ, পৃ. ৩২
৯. 'জগমোহনের মৃত্যু', ঐ, পৃ. ২২৪
১০. 'বাঁয়েন', ঐ, পৃ. ৫২
১১. সরকার শ্রী প্রভাত রঞ্জন, 'বুদ্ধির মুক্তি-নব্য মানবতাবাদ', প্রকাশ, অবধূত সুগতানন্দ আচার্য কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সচিব, আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ ৫২৭, ভি.আই.পি নগর, কলকাতা, ৭০০১০০

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদনা) : মহাশ্বেতা, 'নানা বর্ণে ও নানা রঙে' প্রথম প্রকাশ- ১৫.০৫.২০১৫, কলকাতা – ০৯
২. বসু, নন্দিতা : 'ভূমিকা মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র' খন্ড ১০, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ– ২০০৩, কলকাতা– ০৯
৩. বুসু, নিতাই : অগ্নিগর্ভ অরণ্যচারী মানুষের রূপকার মহাশ্বেতা দেবী, শিলাদিত্য, জুন, ১৯৮২
৪. বন্দোপাধ্যায়, ভারতী : মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প, শিল্প আর বাস্তবতার মেলবন্ধন, কোরক, মহাশ্বেতা সংখ্যা, বইমেলা ১৯৯৩, পু.মু. কোরক, মহাশ্বেতা, বইমেলা– ২০০৩
৫. বন্দোপাধ্যায়, শমীক, ভূমিকা : 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩
৬. বসু, শর্মিলা : 'মানুষ এবং মানুষ এবং মানুষ' গ্রন্থ সমালোচনা মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প প্রমা, রজত সংখ্যা, ১৯৫৮
৭. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ (সম্পাদনা) 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ১৪
৮. ভট্টাচার্য্য, সুতপা : 'আমি আমার মতো লিখি', শিল্প-সাহিত্য, মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি -২০০৯